তর্কে বহুদূর

মৈত্রীশ ঘটক

১

বিতর্ক যদি অলিম্পিকে ক্রীড়া বলে স্থান পেত, তাহলে বাঙালির শিল্প-সাহিত্য বা লেখাপড়ার জগতে যেমন খ্যাতি, খেলাধুলোর জগতেও হত। *অচ্ছে দিন* না আসুক, কলকাতা লন্ডন না হোক, বাঙালি আর নোবেল না পাক, কিছু সোনারূপোর মেডেল তো আসত চার বছর অন্তর । বিষয় যাই হোক - তৃণমূল-বিজেপি, সিপিএম-নকশাল, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, সমাজতন্ত্র-ধনতন্ত্র, সত্যজিৎ-ঋত্বিক, বাঙাল-ঘটি, হোমিওপ্যাথি-আলোপ্যাথি, বা মারাদোনা-মেসি – আর অন্তত জনা কয়েক লোক যদি পাওয়া যায় (যদিও একজনের কথা শুনেছি যিনি একা একাই তর্ক করেন কাউকে না পেলে), কোথায় লাগে আইপিএল বা প্রিমিয়ার লীগ।

এই দেখুননা, দেশে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর ভোটযুদ্ধ শেষ হল কয়েক মাস হল, কিন্তু এখনো রাজনীতি নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বাড়ির ড্রইংরুম হয়ে টিভি তথা সামাজিক (বা, অসামাজিকও বলা যায়) মাধ্যমে তার রেশ এখনও টাটকা। অনেকসময়েই তর্কের পারা এতটা চড়ে যায় যে সারাদেশে এরকম লাখো লাখো বিতর্কের ঠেক থেকে তার লাগিয়ে সেই উত্তাপ ঠিকমত সংগ্রহ করতে পারলে তা দিয়ে গোটা দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়া যেত অনায়াসে। তবে তেমন প্রযুক্তির অস্তিত্ব অবশ্য "সবই প্রাচীন ভারতে ছিল"-মার্কা ভক্তবৃন্দের উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া আর কোথাও আছে বলে এখনও জানা যায়নি।

তাই প্রশ্ন ওঠে, এই গরমাগরম তর্কাতর্কিতে কোন উদ্দেশ্যটা সাধিত হচ্ছে? লোকে তর্ক করে কেন? তর্ক, ঝগড়া আর আলোচনার মধ্যে তফাৎ কি? আর তিক্ততা বা দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে জেনেও বন্ধু ও প্রিয়জনের সাথে আমরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি কেন?

২

অনর্থক তর্কের বিশুদ্ধতম উদাহরণ সুকুমার রায়ের "নারদ! নারদ!" :

"হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল সাদাকে বলেছিলি লাল?
(আর) সেদিন নাকি রাত্রি জুড়ে নাক ডেকেছিস বিশ্রী সুরে?
(আর) তোদের পোষা বেড়ালগুলো শুন্‌ছি নাকি বেজায় হুলো?
(আর) এই যে শুনি তোদের বাড়ি কেউ নাকি রাখেনা দাড়ি?"

এখানে তর্কের ভিত্তি দুটি মানুষের রুচির পার্থক্য (দাড়ি রাখা না রাখা, হুলো এবং মেনী বেড়ালের মধ্যে আপেক্ষিক পছন্দ-অপছন্দ) অথবা একজনের বিশ্বাসযোগ্যতা (সাদাকে লাল বলা) বা তার শারীরিক বিশেষত্ব নিয়ে কটাক্ষপাত (নাক ডাকার অভ্যেস বা সেই ডাকের সুরের উৎকর্ষ)। হুমকি দিয়ে বা জোর খাটিয়ে নয়তো সাধাসাধি করে না থামালে এই বিতর্কের নিষ্পত্তি হওয়া মুশকিল। এই ছড়াটির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত হয়ও তাই।

ছড়াটির হালকা উদাহরণগুলো বাদ দিলেও, দুই প্রিয় খেলোয়াড় বা দল বা গায়ক বা অভিনেতা বা সাহিত্যিক বা চিত্রপরিচালক নিয়ে এরকম তর্ক আমরা হামেশাই দেখে থাকি, এমনকি নিজেরাও করে থাকি কখনো কখনো । এইরকম মতপার্থক্য যেখানে, সেখানে কি করা উচিৎ? অন্যান্য অনেক বিষয়ে মত ও রুচির মিল থাকলে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা (এই ছড়াটির শেষ অংশ থেকে বোঝা যায়, দুজনেই মশলা খেতে ভালোবাসে), বিতর্কিত প্রসঙ্গগুলো (বেড়াল, দাড়ি, নাকডাকা ইত্যাদি) এড়িয়ে যাওয়া, আর নেহাতই এসব কিছু সম্ভবপর না হলে, ভবিষ্যতে পরস্পরকে এড়িয়ে চলা।

এইরকম তর্কের আরেকটা উদাহরণ আমেরিকার গার্শউইন ভাইদের (আইরা ও জর্জ) লেখা বিখ্যাত এক গান যা এলা ফিট্‌সজেরাল্ডের গলায় অনেকেই শুনেছেন :

"You like potato and I like potahto
You like tomato and I like tomahto
Potato, potahto, Tomato, tomahto.
Let's call the whole thing off."

এখানে এক প্রণয়ী যুগলের মধ্যে তর্কের বিষয় হল ইংরেজিতে আলুর সঠিক উচ্চারণ "পটাটো" না "পটেটো" আর সেরকম কথাটা "টমাটো" না "টমেটো"। এরকম অনেক শব্দের উচ্চারণ নিয়ে মতপার্থক্য যখন মাত্রাছাড়া হবার মুখে, প্রায় সম্পর্কচ্ছেদ হওয়া আসন্ন, তখন শুভবুদ্ধির উদয় হচ্ছে, এই কথাগুলো বলে :

"But oh if we call the whole thing off then we must part
And oh, if we ever part, then that might break my heart."

প্রিয়জনের সাথে বিচ্ছেদ বড়ই বেদনাদায়ক। আর, রুচি নিয়ে যেমন তর্ক করার মানে হয়না, সেরকম নেহাতই ভুল না বললে একই কথার দুরকম প্রচলিত উচ্চারণ নিয়েও তর্ক করার মানে হয়না।

বুদ্ধদেব বসু ১৯৪০ সালে লেখা তাঁর "মতান্তর ও মনান্তর" প্রবন্ধে (*উত্তরতিরিশ* , নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫) একই কথা লিখেছেন, যে খাওয়া-পরা, আমোদ-প্রমোদের রুচিবৈষম্যে খুব একটা কিছু এসে যায়না। তাঁর উদাহরণ হল শুঁটকি মাছ বা তাসখেলায় আসক্তি – দুইই তাঁর পছন্দের নয় কিন্তু তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ খুবই পছন্দ করেন। এই সব ক্ষেত্রে মতান্তর থেকে বিতর্কের বা মনান্তরের সম্ভাবনা কম। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুচি বা মতাদর্শগত বৈষম্য এত মৌলিক যে সেখানে বিরোধ এবং মনান্তর অবধারিত আর তাই এই ক্ষেত্রে পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। তাঁর একটি উদাহরণ হল সাহিত্যের জগত থেকে। তাঁর কাছে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কেউ না হলে, তাঁর সাথে আলোচনার অর্থ নেই, "কেননা রবীন্দ্রনাথকে যিনি অবজ্ঞা করেন, তিনি আমার অস্তিত্বসুদ্ধু অস্বীকার করেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির উপরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি।" এই প্রবন্ধের অন্য উদাহরণটি রাজনৈতিক মতাদর্শের জগৎ থেকে। বিশেষ কোন ব্যক্তিকে কেউ যদি অতিমানুষ বলে মানেন আর কেউ ভাবেন স্বেচ্ছাচারী একনায়ক, কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে কেউ যদি আদর্শ বলে ভাবেন, আর কেউ মনে করেন প্রবল ক্ষতিকারক, সেখানে খুব বেশি আলোচনার জায়গা নেই। আলোচনা হলে শুধু তিক্ততাই হয়।

একথা ঠিকই যে রুচি আর মতাদর্শ নিয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকলে, সেখানে তর্ক করার খুব একটা অর্থ হয়না। তবে সব তর্ক রুচি বা মতাদর্শ নিয়ে নয়। কিছু উঠে আসে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে আলাদা ব্যাখ্যা থেকে। তথ্য বা প্রমাণ যেহেতু সচরাচর সীমিতই হয়, বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকারণ নিয়ে মতভেদ হতেই পারে। পরশুরামের "মহেশের মহাযাত্রা" গল্পে মহেশ এবং হরিনাথের ভূত আছে কিনা এই নিয়ে বাদানুবাদ এইরকম তথ্য-ভিত্তিক বিতর্কের উৎকৃষ্ট উদাহরণ, এবং শেষ পর্যন্ত তার ফয়সালা একইসাথে বৈজ্ঞানিক এবং অলৌকিক, কারণ আজীবন ভূতে অবিশ্বাসী মহেশ মরে গিয়ে এবং নিজে ভূত হয়ে প্রমাণ পেলেন যে ভূত আছে! এখানে কিন্তু তর্কটি আরও জটিল – শুধু রুচির পার্থক্য নয়, বাস্তব (বা, এইক্ষেত্রে পরাবাস্তব) জগৎ নিয়ে গভীর মতপার্থক্য, যার সমাধান উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে সম্ভব, কিন্তু সেরকম প্রমাণ অনেকসময়েই জোগাড় করা অসম্ভব।

বিদ্যাচর্চা বা গবেষণার জগতে এরকম বিতর্ক সবসময়েই চলে । কোন ঐতিহাসিক ঘটনার আলাদা ব্যাখ্যা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে, বা দারিদ্র দূরীকরণ বা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্যে কোন নীতির কি ফল হবে তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক তো সর্বদাই চলছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও আলাদা তত্ত্ব নিয়ে বা একজনের গবেষণালব্ধ প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কি না এইসব নিয়ে হামেশাই বিতর্ক চলছে। এখানে মতাদর্শগত ফারাক থাকলেও সেটা গৌণ, মতান্তরের সূত্র হল একই ঘটনাবলীর কার্যকারণ নিয়ে আলাদা ব্যাখ্যা ।

সেরকম মতাদর্শগত মিল থাকলেও, রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রেও অনেক সময় তর্ক হয় বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা, তার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে মতান্তরের কারণে। আমি নিজে তর্ক করি, করতে ভালোও বাসি যদি তর্কটা জমে এবং তার থেকে দুপক্ষেই কিছু শেখা যায়। বন্ধুমহলে তার্কিক হবার দুর্নাম থাকার জন্যেই হয়তো আমার বন্ধু বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক অনীক দত্তের "ভবিষ্যতের ভূত" ছবির চিত্রনাট্য লেখার সময় তাঁর কাছ থেকে অনুরোধ আসে দুই বামপন্থী ভূতের তর্কের কিছু সংলাপ ভাবতে। কট্টর আর মুক্তমনা দুই বামপন্থী ভূতের তর্কের একটা ছোট খসড়া লিখেছিলাম, ছবিটিতে তার থেকে কয়েকটি সংলাপ ব্যবহারও হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত সংস্করণ নীচে পেশ করছি, তর্কের আরেক উদাহরণ হিসেবে যেখানে রুচির বা মতাদর্শের তফাৎ আপেক্ষিকভাবে গৌণ (সংলাপে "ক" হলেন কট্টরপন্থী আর "মু" হলেন মুক্তমনা) :

ক : পড়েছ খবরের কাগজ? এখন খবর মানেই তো সেই চিটফান্ডকাণ্ডের সিবিআই তদন্তের নতুন মোড় আর দলবদলের রঙ্গ! আর ওদিকে দেশের অর্থনীতির তো অনর্থ বাধিয়ে দিয়েছে সেন্টার! পরিবর্তন, অচ্ছে দিন করে আরও নাচুক পাবলিক! আমাদের সময়ে ...

মু : আরে, রাখুন মশাই! কি হাল দাঁড়িয়েছিল চৌত্রিশ বছরে? বামফ্রন্ট নামের মধেই তো সমস্যা – bum ফ্রন্টে হলে প্রগতি আর হবে কি করে !

ক : এই শুরু হল তোমাদের কলেজ ক্যান্টিন মার্কা ফক্কুড়ি ! ব্যাপারটা সিরিয়াস হে, বুঝলে... চৌত্রিশ বছরে সব ভাল হয়েছে বলবনা, কিন্তু পঞ্চায়েতব্যবস্থার প্রচলন, অপারেশন বর্গা, সীমিত ভূমিসংস্কার এরকম কিছু কাজ তো হয়েছে। পরিবর্তনের জমানায় নীলসাদা আলো আর দিদিকে বলো ছাড়া সেই রকম বলার মত কি হয়েছে বলো? আর সেন্টার? সেখানে তো গবর্মেন্ট তো গোবর-মেন্ট হয়ে মানুষ ছেড়ে গরুর সেবা করছে!

মু : সেই সত্তর দশকের শেষে কি হয়েছিল এসব বলে আর কতদিন চলবে? দেখুন আপনার মত অনেক নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের সততা ও আদর্শবাদকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আপনাদের দলের কর্মসূচী তো বাস্তবে মার্ক্সবাদ মানে মার্ক্সকে বাদ, দাস ক্যাপিটাল ছেড়ে ক্যাপিটালের দাস, আর লেনিন মানে লুম্পেনদের লে আর মধ্যবিত্তকে নিন বলে পাইয়ে দেবার পাইকারী রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল!

ক : দেখো ভাই, বামফ্রন্ট সরকার কিছু করেছে তাই ভুলও করেছে। তোমাদের মত শখের মুক্তমনা বামপন্থী আর চাকুরীজীবি পার্ট-টাইম বিপ্লবীদের তো ডায়লগ দেওয়া আর সবার ভুল ধরা ছাড়া আর কিছু করতে হয়না, তাই অতি-বিপ্লবী হওয়া সাজে । এদিকে "চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান" তো "চিনের চাউমিন আমাদের চাউমিন" হয়ে দাঁড়িয়েছে। নকশাল...হুঃ!

মু : আমি নকশাল নই – মায়ের চেয়ে মাওয়ের ওপর বেশি দরদ আমার নেই। কিন্তু বাস্তবটাকে তো মানতে হবে! সংসদীয় বামপন্থা তো ব্যবসায়ী আর প্রমোটারের সাথে বাঁ

হাতের কারবার তৈরি হয়েছিল আপনাদের জমানায়। আর বাহাত্তুরে বুড়োদের দিয়ে ভর্তি ওটা কি পলিটবুরো, না পলিটবুড়ো? নেতৃত্বে নতুন প্রজন্ম উঠে না এলে নতুন চিন্তাভাবনা কর্মসূচী এসব আসবে কোথা থেকে? বুড়ো বাম বা বুড়ো ভাম এসব দিয়ে কিছু হয়! দেখুননা, এই নির্বাচনেই তো রাজ্যে লাল পতাকা ধুয়ে গেরুয়া রঙ বেরিয়ে পড়ছে! অতীতে কি ছিল সেটা না ভেবে এই অবস্থা কি করে হলে, আর পাল্টাবেই বা কি করে সেটা ভাবা উচিৎ না?

ক : সে কথা ঠিক। তবে কোন যে আশা নেই তা নয়, কানহাইয়া ছেলেটা কিন্তু সত্যি খুব ভাল বক্তা। আর দেখনা এবারের জেএনইউ-এর ছাত্রসংসদ নির্বাচনে বামজোট বিপুল ব্যবধানে জিতেছে ...

হাস্যকৌতুক এবং পরস্পরকে খোঁচা বাদ দিলে, এখানে মতান্তর মতাদর্শগত নয়, ব্যক্তিগত পছহন্দ-অপছন্দও এখানে গৌণ। বাম রাজনীতির যে আদর্শ, তা নিয়ে দুপক্ষই একমত। বরং, মতভেদের মূল ভিত্তি হল, সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের কর্মপন্থা কি হওয়া উচিৎ সেই নিয়ে। সেই নিরিখে বামফ্রন্ট জমানার মূল্যায়ন এবং বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাম আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবার উপায় এই সব নিয়ে বিকল্প চিন্তাভাবনাই মতান্তরের কারণ।

এই উদাহরণ ছেড়ে বেরিয়ে আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে ভাবলে, এখানে মতান্তরের মূলে আছে বাস্তব পৃথিবীতে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ কি এবং একই ঘটনাবলীর কার্যকারণ নিয়ে আলাদা ব্যাখ্যা। ভারতে বৃদ্ধির হার এই মুহূর্তে যে রীতিমত কম, এই বিষয়ে কিছুদিন আগে অবধিও বিতর্ক ছিল যে জাতীয় আয় ও তার বৃদ্ধির হার ঠিক করে মাপা হচ্ছে কিনা সেই নিয়ে। এখন সমস্ত অর্থনৈতিক সূচক একই কথা বলায়, বিতর্ক গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই মন্দা স্বল্প না দীর্ঘমেয়াদী, তার জন্যে দায়ী মোদী-সরকারের নীতি না অন্যান্য কারণ (যথা, বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, আগের সরকারের নীতির জের), এবং কি করা উচিৎ সেই নিয়ে।

বিতর্কের রকমফেরের উদাহরণ থেকে আবার ফিরে আসি মূল প্রশ্নগুলোয় : তর্ক-ঝগড়া-আলোচনার মধ্যে তফাৎ কি? এগুলো লোকে করে কেন? আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কের সুফল যদি থাকেও, আত্মীয়-বন্ধু মহলে যেখানে মতান্তর মনান্তরে পরিণত হওয়ার পরিণতি বিশেষভাবে অপ্রীতিকর, সেখানে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বিতর্কে ঢোকার ঝুঁকি কি নেওয়া উচিৎ?

খেয়াল রাখতে হবে, যেমন মারামারি আর ক্রীড়াক্ষেত্রে বক্সিং এমন কি ফুটবল বা রাগবি এক নয় সেরকম ঝগড়া আর বিতর্কও এক নয়। যিনি এই সব ক্রীড়ার সাথে পরিচিত নন - যেমন ধরুন টাইম-মেশিনে অতীত যুগের কোন মানুষ বা অন্য গ্রহের প্রাণী এসে প্রথম যদি রাগবি বা বক্সিং ম্যাচ দেখেন - এক নজরে এগুলো আর মারামারির মধ্যে তফাৎ করতে পারবেননা।

মারামারির মত, ঝগড়ারও একমাত্র উদ্দেশ্য নিজের মত বা ইচ্ছেটা আরেকজনের মত বা ইচ্ছের ওপর চাপিয়ে দেওয়া, শক্তিপ্রদর্শন বা আধিপত্য জাহির করা। তাতে যুক্তি বা তর্কের ব্যবহার হতে পারে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে জেতা এবং অন্যপক্ষকে পর্যুদস্ত করা। এইখানে তার মারামারির সাথে মিল। খেলার মাঠেও যদিও জেতাটাই উদ্দেশ্য, কিন্ত নিয়মকানুন মেনে খেলতে হয়, অসৎ উপায়ে বা গায়ের জোরে জেতাটা জেতা বলে গ্রাহ্য হয়না।

এখন প্রশ্ন হল, নিয়মগুলো আছে কেন? কোন নিয়মকানুন ছাড়া ক্রীড়া আর মারামারির মধ্যে কোন তফাৎ থাকেনা আর তাই সেখানে ক্রীড়াকৌশল দেখাবার কোন অবকাশ থাকেনা। নিয়মগুলো আছে যাতে ক্রীড়াশৈলী দেখে দর্শকরা আনন্দ পান আর খেলোয়াড়রাও তাঁদের প্রতিভা ও পরিশ্রম দিয়ে অর্জিত যে উৎকর্ষ, তা সর্বসমক্ষে দেখিয়ে তার জন্যে দর্শকদের বাহবা পান। তাই, ক্রীড়ার মূল্য বুঝতে গেলে শুধু দুই পক্ষের হারজিত দেখলে চলবেনা, ক্রীড়াশৈলীর উৎকর্ষ এবং তার থেকে যে বিনোদন, উত্তেজনা, এবং অনুপ্রেরণা পান ক্রীড়াপ্রেমীরা সেটাও দেখতে হবে। মতি নন্দীর স্টপার বা কোনি উপন্যাস স্মরণীয় শুধু কে জিতল কে হারল সেই আখ্যানের জন্যে নয় - বরং এর থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষের সাধনার যে মানবিক আখ্যান বেরিয়ে আসে তারই আবেদন সর্বজনীন।

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে তাই কোন নিয়ম (আর নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা যাচাই করার জন্যে রেফারি বা আম্পায়ার) যদি না থাকত তাহলে সব ছাপিয়ে গায়ের জোরেরই জয় হত, খেলোয়াড়দের দক্ষতা বা উৎকর্ষ চোখে পড়তনা। এখানেই ক্রীড়া আর মারামারির মধ্যে তফাৎ। এমনকি বক্সিং বা কুস্তির মত যে খেলাগুলো সংগঠিত ও নিয়মবদ্ধ মারামারি ছাড়া কিছু নয়, তাদেরও এমনি মারামারির সাথে তফাৎ ঐ নিয়ম মানার মধ্যেই। এর ফলে কম বলশালী কেউ কৌশল, পরিশ্রম, প্রতিভা, ও

মনের জোরে অধিক বলশালী কাউকে হারিয়ে দিতে পারেন (যেমন, মহম্মদ আলি) এবং তাঁদের থেকে
অন্যরা অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা নিতে পারে।

ক্রীড়ার মত বিতর্কেরও নিয়ম আছে, শুধু পাণ্ডিত্য বা গলার জোর বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জেতা যায়না। এখানেই ঝগড়ার সাথে বিতর্কের পার্থক্য। ঝগড়ায় কোনরকমে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করাটাই যথেষ্ট। তাই দমে বা গলার জোরে টান না পড়লে কোন পক্ষই থামতে পারেননা, কারণ থামা মানেই হারস্বীকার। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের আশ্চর্য ভ্রমণ উপন্যাসে একটি ঝগড়ার অনবদ্য বিবরণ আছে, যেখানে বাসে দুই যুযুধান যাত্রী একনাগাড়ে ঝগড়া করে কথা (এবং সম্ভবত দম) ফুরিয়ে যাওয়ায় পরস্পরের প্রতি "অ্যাঁঃ অ্যাঁঃ অ্যাঁঃ" আর "ঙ ঙ ঙ!" বলে যাচ্ছিল। অথচ যুক্তি বা তথ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারলে, গলা তোলার বা অর্থহীন চেঁচামেচি বা গালমন্দ করার দরকার হয়না।

সবসময় গলার জোর নয়, শঠতারও ব্যবহার হয় ঝগড়ায় । কে বেশি ইংরেজী জানে সেই নিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "মাস্টার মহাশয়" বলে সেই বিখ্যাত গল্প মনে পড়ে যায়। দুজনের মধ্যে কে ইংরেজি বেশি জানে সেই নিয়ে ঝগড়া চলছে, তার নিষ্পত্তি করতে এক নাগাড়ে একে অপরকে শক্ত ইংরেজি শব্দের বাংলা মানে জিজ্ঞেস করে হারাতে পারছেনা। একজন তখন চালাকি করে জিজ্ঞেস করলেন "I don't know" এর বাংলা কি। প্রতিপক্ষ সঠিক উত্তর দিলেন "আমি জানি না"। তখন প্রথমজন ইংরেজি না-জানা গ্রামবাসীদের সামনে প্রবল উৎসাহে নিজের জয় ঘোষণা করলেন! শ্রোতাদের মধ্যে কেউ যদি ইংরেজি জানতেন বা এই বিতর্কের যদি কোন বিচারক থাকতেন তাহলে কিন্তু এই কৌশলে কাজ হতনা।

বিতর্ক যাতে ঝগড়া না হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্যে নিয়ম এবং নিয়ম প্রয়োগ করার ব্যবস্থা তাই আবশ্যক। যেমন থাকে বিতর্কসভা বা পার্লামেন্টে। তা না হলে, (গলার) জোর যার মুলুক তার আর তাতে ক্ষতি বাকিদের যাঁরা বিতর্কের থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করছেন, নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যুযুধান পক্ষের বক্তব্যের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছেন। শুধু গোলমাল আর হট্টগোল হলে তা সম্ভবপর নয়। আর নিয়মের নিয়ন্ত্রণ থাকলে যুযুধান পক্ষও যুক্তি, তথ্য ও বাগ্মীতা ব্যবহার করার উৎসাহ পাবেন, এই জেনে যে শুধু গলার জোরে জেতা যাবেনা ।

এতো গেল বিতর্ক আর ঝগড়ার তফাৎ। এখানে মূল সমস্যা হোল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ন্ত্রণে রেখে যুযুধান পক্ষের আপাতবিরোধী বক্তব্য থেকে শ্রোতাদের কোন বিষয়ে কতটা ঐকমত্য সম্ভব এবং দ্বিমতের ভিত্তি কি সেটা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা তৈরি হওয়া। বিতর্ক আর আড্ডা বা আলোচনাও আবার এক নয়। ঠিক যেমন ফুটবল ম্যাচ আর পিকনিকে বন্ধু আর আত্মীয়দের সাথে ছোট-বড় সবাই মিলে ফুটবল নিয়ে হুটোপাটি করা এক নয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবটা প্রধান, যদিও তার থেকে যে ক্রীড়াকৌশলীর উৎকর্ষ বেরিয়ে আসে, তাতে খেলোয়াড়, দর্শক, এবং ক্রীড়াপ্রেমী সবাই আনন্দ পান। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বিনোদনই আসল লক্ষ্য, প্রতিযোগিতার কোন জায়গা নেই। বরং হালকা মেজাজে সবার সাথে মিলে মজা করার গুরুত্বই বেশি, প্রতিযোগিতার মনোভাব এসে গেলে সেই আনন্দটাই মাটি হয়। এখানে তাই সমস্যা হোল সবাই খোলাখুলি নিজের মতপ্রকাশ করতে চাইবেননা, যাতে সবাই মিলে আনন্দ করার পরিবেশ ব্যাহত না হয়। ঐকমত্যের বাসনায় বা কে কি ভাববে চিন্তা করে অনেক কথাই মনে হলেও বলা হয়ে ওঠেনা। তাই আড্ডা থেকে শেখারও সীমাবদ্ধতা আছে।

তার মানে বিতর্ক ঝগড়া নয়, আবার আড্ডাও নয়, তার মাঝামাঝি কিছু। সবাই সব বিষয়ে একদম একমত হলে, কথাবার্তা একদম পানসে হয়ে যায়। শুধু তাই না, তার থেকে কারোর কিছু শেখারও থাকেনা, বদ্ধ ডোবার মত পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন বা বিবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকেনা। কিছুটা মতান্তর তাই আবশ্যক এবং স্বাস্থ্যকর। যেমন, আপনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার ভক্ত না হতে পারেন, তাঁর কবিতা অহেতুকরকম দুর্বোধ্য বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু যিনি তাঁর কবিতার ভক্ত তাঁর সাথে তর্ক করলে অন্তত কেন যথেষ্ট বিদগ্ধ কোন পাঠকের সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ভালো লাগে, তার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। এতে আপনি আপনার মতামত নাও পালটাতে পারেন, কিন্তু এই বিতর্ক থেকে শেখা অন্য পক্ষের মত এই বিষয় ছাপিয়ে কবিতার রসাস্বাদন করার ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। আসলে উৎকর্ষের তো অনেকগুলো মাত্রা থাকে এবং ব্যক্তিবিশেষে সেগুলোর গুরুত্ব আলাদা হতেই পারে, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ আলোচনা করলে সেই মাত্রাগুলো সম্পর্কে আমাদের চেতনা সমৃদ্ধ হয়। এখানে মতান্তর আপনার মানসিক বিস্তারের সহায়ক।

গবেষক হিসেবে আমি অনেক সময়েই সহ-গবেষকের সাথে তর্ক করি আমাদের নিজেদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে, বা এই ধরণের কাজের যারা কড়া সমালোচক, তাঁদের সামনে গবেষণার ফল পেশ করি তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে। এর উদ্দেশ্য আমাদের যুক্তি বা তথ্যের যেগুলো

দুর্বলতা সেগুলো বুঝে তাদের আরও জোরদার করা। ঠিক যেমন ভালো প্রতিপক্ষের সাথে খেলে আমরা খেলা শিখি, যাতে আমাদের নিজেদের দক্ষতাও বাড়ে।

তবে, আগেই বলেছি, আবার একেবারে মতের কোন মিল না হলে (যেমন, মৌলিক কিছু আদর্শ বা মূল্যবোধ), প্রতিপদেই তর্ক থেকে ঝগড়া বেঁধে যাবার সম্ভাবনা। আর কিছু লোক থাকেন তাঁদের অহমিকার কারণে মতাদর্শে মিল থাকলেও তাঁদের সাথে বিতর্ক করে কিছু শেখা যায়না, কারণ তাঁরা নিজেদের অভ্রান্ত এবং সর্বজ্ঞ মনে করেন এবং একমত না হলে আপনাকে "দুষ্টু লোক" ভাবেন। এঁদের এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মুশকিল হোল, সবসময় আমরা বন্ধু বা আত্মীয়দেরও সব ব্যাপারে মতামত জানিনা। কথাপ্রসঙ্গে কোন বিতর্ক বেধে যাবার সম্ভাবনা হলে, কি করা উচিৎ? বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-পরিজনের ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়না, আবার আদর্শ বা মূল্যবোধের সংঘাত ব্যক্তিগত সংঘাতের রূপ নিয়ে ফেলতে পারে, আর ঘনিষ্ঠমহলে সম্পর্কচ্ছেদ কাউকেই সুখী করে না। তা সত্ত্বেও অন্তত সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রটুকুতে ঝগড়াঝাঁটি এড়িয়ে গেলেই তো হয় - ভিন্নমতের অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার বদলে ভিন্ন ভিন্ন পথে এগিয়ে যাওয়ায় কি লাভ? আসলে সমস্যা হোল কিছু কিছু বিতর্ক তুষারশৈলর মত হঠাৎ আমাদের ধাক্কা দেয় – যেমন, যে আত্মীয়কে এতদিন রাজনৈতিক আলোচনায় চুপচাপ দেখেছি নির্বাচনের ফল জানার পরে তিনি যদি বলেন তোমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা আর উদারপন্থা মেকী আর দেশের আমজনতা যা বোঝে এত পড়াশুনো করে তোমরা তা বোঝোনা। এই পরিস্থিতিতে কি প্রসঙ্গ পাল্টে তাঁর স্বাস্থ্য বা আইপিএল নিয়ে কথা বলা উচিৎ, নাকি তিনি সাম্প্রদায়িক বা অজ্ঞ (বা দুটোই) এটা প্রতিপন্ন করতে যুক্তি-তথ্য সাজানো উচিৎ?

এখন, ঠিকই যে যা করা উচিত সেটা আমরা তো অনেক সময়েই করি না। কোনও না কোনও বিয়েবাড়িতে আরেকটা ফিশ-ফ্রাই নিয়ে পরে পস্তেছি আমরা সকলেই, কোনও না কোনও ডেডলাইনের আগের দিন রাত জেগে খেলা বা জমজমাট সিনেমা দেখে পরে হাতও কামড়েছি। বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে রাজনৈতিক তর্কের ব্যাপারটাও যদি তেমন হয় তাহলে কিঞ্চিৎ আত্মসংযম, আর ভোটের মরসুমি ঝড় কিছুটা শান্ত হওয়ার আগে অবধি কোনও রকম সামাজিক মেলামেশা থেকে বিরত থাকলেই সামলে দেওয়া সম্ভব।

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই এতটা সরল?

৪

যা বোঝা গেল তা হোল বেশিরভাগ তর্কের মূলে আছে তিনটি ব্যাপারে বিরোধ - ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, মতাদর্শ, এবং বাস্তব ঘটনার কার্যকারণ নিয়ে ব্যাখ্যা ও তথ্যপ্রমাণ। আবার বিষয় যাই হোক না কেন, কেউ কেউ আছেন বিতর্ক করেন এমনভাবে যাতে মতান্তর কখনই মনান্তরে পরিণত হয়না, বরং সেই বিতর্ক থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। আবার অনেকে আছেন যাঁদের সাথে মতের মিলের ফারাক স্বল্প হলেও, তাঁদের অহংবোধ প্রবল, তাঁদের সব কথায় সায় না দিলে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিতর্কও ঝগড়ায় পরিণত হতে পারে। তাঁরা বলতে এসেছেন শুনতে নয়, তাঁরা শেখাতে এসেছেন শিখতে নয়। বলাই বাহুল্য, এঁদের সাথে বিতর্ক বিষবৎ পরিহার্য ।

আগেই বলেছি মতান্তর যদি হয় ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে, যেখানে জোরজবরদস্তি না করে "যার যেমন ইচ্ছে" এইধরণের নিয়ম মেনে চললে মনান্তর হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু মানুষ অনেকসময়েই নিজের মতামত নিয়েই যে শুধু অটল তাই নয়, অন্যের মতামত নিয়েও তাদের মতামত খুবই প্রকট, সে পোশাক হোক, কি খাদ্যরুচি, কি বই বা সিনেমার পছন্দ-অপছন্দ। খেয়াল করে দেখুন গত কয়েক বছরে গোমাংস নিয়ে কতগুলো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে বা কোন বই বা সিনেমা "আপত্তিকর" বলে তাদের নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। আপনি গোমাংস (বা কোনরকম মাংস) খাবেননা, খাবেননা, অন্যরা খেলে আপত্তি কি? আপনি কোন বই ধর্মীয় কারণে আপত্তিকর বা অশ্লীল মনে করেন, পড়বেননা, কিন্তু অন্যরা পড়লে আপত্তি কি? আপনি বিবাহিত দম্পতি ছাড়া আর কোনধরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মানেননা, ঠিক আছে, কিন্তু আপনার অপরিচিত কেউ কিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অতিবাহিত করছে তাতে আপনার কি? ব্যক্তিগত রুচির স্বাধীনতা এবং প্রত্যেক মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস রাখলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতে দেওয়া আদৌ কাম্য নয়। কারণ এই একই যুক্তি ব্যবহার করে অন্য কোনও জনগোষ্ঠীরও তো আমাদের রুচি-পছন্দ-জীবনযাত্রায় নাক গলাতে পারে (বিশেষত এখন যেমন ডাইনে-বাঁইয়ে সবার কথায় কথায় "অনুভূতিতে আঘাত" লেগে যাচ্ছে)। হ্যাঁ, অন্য লোকের রুচি যখন সরাসরি আমাদের জীবনযাপনে প্রভাব ফেলছে (যেমন পাশের বাড়ি থেকে জগঝম্প 'রক মিউজিক' কী পুজোর সময় মাইকের দৌরাত্ম্য), সে সব ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন থাকা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু সার্বিক ভাবে

দেখতে গেলে, রুচির পার্থক্য থাকলে ভিন্নমতের অধিকার মেনে নেওয়া অথবা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখাই সামাজিকতা রক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মনে হয়।

মতাদর্শ বা মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী মনে করেন জাতীয় স্বার্থে ব্যাক্তিস্বাধীনতা খর্ব করাই যেতে পারে, আবার একজন উদারপন্থী বলবেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে কোন অজুহাতেই হাত দেওয়া অতি অন্যায় – এঁদের মধ্যেও তো মতের মিল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে অহেতুক মাথা গরম করে গলার শিরা ফুলিয়ে এবং নিজের তথা আশপাশের সকলের রক্তচাপ বৃদ্ধিতে ইন্ধন দেওয়ার চেয়ে, মতে না মিললে রাজনীতি নিয়ে কথা না বলা, বা তার চেয়েও ভালো কথাবার্তার পাট চুকিয়ে দেওয়াই কি শ্রেয় নয়? সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার নিয়ে ভিন্নমতকে যে দক্ষিণপন্থী 'অ্যান্টিন্যাশনাল' আর 'সিউডো-সেকুলার' বলে দাগিয়ে দিতে অভ্যস্ত, তাকে আপনি কি বলতে পারেন যাতে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পালটাবেন? একইভাবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নিয়ে সামান্য মতের অমিলেই যে বামপন্থী আপনাকে 'নব্যউদারবাদী' (এঁদের কাছে বাজার অর্থনীতির অন্ধভক্ত আর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট সবাই সমান) বলে দাগিয়ে দেন, তাঁকে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" বলে সরে পড়া ছাড়া আর কীই বা করার আছে?

মতাদর্শ ঠিক করে দেয় আমাদের চোখে আদর্শ সমাজের মাপকাঠি কী কী। আর সৌন্দর্য যেমন শুধুমাত্র উপযুক্ত দ্রষ্টার চোখেই প্রতিভাত, ঠিক সেভাবেই আদর্শ সমাজের কল্পনাও আমাদের চোখে বসানো মতাদর্শের চশমা অনুযায়ী বদলে বদলে যায়। কিন্তু যদি ধরে নিই যে আমার ব্যক্তিগত মতামতের সীমানা আপনার নাকের ডগা অবধি গিয়েই শেষ হচ্ছে, তাহলে এহেন নাক ঘষাঘষি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কথায় কথায় একে অপরকে 'সঙ্ঘী' বা 'নকশাল' হেন মধুর বিশেষণে ভূষিত করার থেকে কথায় রাশ টানাই কি উচিত হবে না?

কথোপকথনের বিষয় হিসেবে বরং কত গরম পড়ল আর বৃষ্টি কবে আসবে সবসময়েই নিরাপদ, কিংবা ক্রিকেট (খালি ঐ পাকিস্তান আর ১৯৮৬-এর শারজায় মিয়াঁদাদের ঐ শেষ বলে ছক্কার ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে হবে), বা বলিউডও চলবে। তা না হলে শরীর আর অসুখ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তো আছেই (তবে, কথাটা হোমিওপ্যাথী বনাম অ্যালোপ্যাথী এই দিকে যেন না চলে যায়)।

সমস্যা হল, তর্কাতর্কিটা অনেকসময়েই প্রত্যক্ষভাবে মতাদর্শ নিয়ে হয় না। হয় খানিকটা পরোক্ষভাবে, যেমন, "অমুককে কী করে ভোট দিতে পারলেন..." আর ইদানীং কুখ্যাত "এটা নিয়ে এত বলছ, অমুক যখন তমুক করেছিল তখন কোথায় ছিলে..." । আর, অন্তত উপর উপর হয় তথ্য আর পরিসংখ্যান নিয়ে । এখন, তথ্যপ্রমাণ নিয়ে যে তর্ক, বিশেষ করে যে সব তথ্য নিরপেক্ষ ভাবে যাচাই করা সম্ভব, সে সব ক্ষেত্রে ভিন্নমতের স্বাধীনতার ব্যাপারটাই খাটে না। তথ্য হয় ভুল নয় ঠিক, কাজেই এ ক্ষেত্রে কোনও এক পক্ষই শুধু ঠিক, অন্য পক্ষ ভুল। যৌক্তিক আলোচনায় বিশ্বাস রাখলে, এক্ষেত্রে অন্তত ভিন্নমতের 'স্বাধীনতা' স্বীকার করে নেওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। তথ্যের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে যদি সন্দেহ থেকে যায়, তাহলে উপস্থিত মুখ বন্ধ রেখে পরে সেই তথ্য যাচাই করে নেওয়াই শ্রেয় (আর মোবাইল ফোন আর গুগলপণ্ডিতের জমানায় অনেক তথ্যই প্রায় তৎক্ষণাৎ যাচাই করা যায়)।

আবার, তথ্য অনেক ক্ষেত্রে সেভাবে যাচাই করার সুযোগ থাকে না, বা তার বাস্তব ভিত্তি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যেতে পারে - যেমন কোনও একটি বিনিয়োগে কতটা মুনাফা আসতে পারে তার হিসেব, কিংবা ধরা যাক সদ্যসমাপ্ত কোনও নির্বাচণের সম্ভাব্য পরিণাম। সে সব ক্ষেত্রেও কিন্তু শুধুমাত্র নিজের মতে চলা এবং অন্যের মতে পাত্তা না দেওয়াটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বাজি ধরলে টাকা মার যাওয়ার ভয় আছে তো! শেয়ার আর ফাটকা খেলার বাজার এই নীতির উপর ভিত্তি করেই কাজ করে। ধরুন, আপনি মনে করছেন কোনও একটি সংস্থার শেয়ারের দাম ভবিষ্যতে বাড়বে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী তা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এবার, যারা আপনার তুলনায় শেয়ার বাজার সম্পর্কে বেশি খোঁজখবর ও অভিজ্ঞতা রাখে, তারা সেই সব শেয়ার আপনাকে বেচে দেবে এবং আপনি কিনেও নেবেন। তারপর যখন সত্যিই সেই সংস্থার শেয়ারের দাম হু হু করে নামবে, তখন আপনাকে আপনার ভুল ধারণার মূল্য চোকাতে হবে। ফাটকা বাজারের ক্ষেত্রে চলতি হাওয়ার উলটো দিকে ঘুরে বসে থাকলে টাকা চোট হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। না, এক্ষেত্রে টাকা মার যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু বন্ধুপরিজনের কাছে কোন বিষয়ে (যেমন, ভোটের ফল) সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হওয়াটাও তো খুব সুখকর ব্যাপার নয়। সাধারণ বুদ্ধি বলে, এসব ক্ষেত্রে নিজের ধ্যানধারণার বিপরীতে গেলেও বিশ্বাসযোগ্য মতামত বা বিবরণ অন্তত খতিয়ে দেখা উচিত।

মুশকিল হল, সত্য যখন নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না, তখন সে সম্পর্কে যে কোনও মতামতই ব্যক্তিগত মত হয়ে দাঁড়ায়। নিরপেক্ষ পর্যালোচনা বা তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে যুক্তির একটা স্বতন্ত্র জোর থাকে, ব্যক্তিগত মত ব্যাপারটা পুরোটাই আপেক্ষিক। যেমন ধরুন নরেন্দ্র মোদীর সমালোচকরা মনে করেন যে তাঁর শাসনকালে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা সুরক্ষার অভাব বোধ করছেন। আবার মোদীর যাঁরা সমর্থক তাঁদের অটল প্রত্যয় যে বিদেশনীতি বিষয়ে তাঁর কঠোর অবস্থান (বালাকোট বায়ু হানা, কাশ্মীরে দৃঢ়মুষ্টিতে শাসন ইত্যাদি) বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তি মজবুত করেছে। স্রেফ তথ্যপ্রমাণ ব্যবহার করে এই ধরণের দাবিগুলির ক্ষেত্রে ঐকমত্য তৈরি করা অনেক বেশি কঠিন, অন্তত অর্থনৈতিক বিষয়আশয়ের তুলনায়। সেখানেও অবশ্য জাতীয় আয় অথবা বেকারত্ব পরিমাপ নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক দেখিয়ে দিচ্ছে "তথ্যের নিরপেক্ষতা" একেবারে সাদা-কালো কোনও বিষয় নয়; তারও আছে বহু স্তর ও বাঁক। এহেন ঘোলাটে জলেই মীমাংসাহীন বিবাদের পরিমণ্ডল পুষ্ট হয়, বাজার গরম হয় 'সে বেলায় কি' (whataboutery) আর 'একপেশে প্রতিবাদ' (selective outrage) এর মত শব্দবন্ধে – গুজরাতে ২০০২ এর দাঙ্গার কথা উঠলেই ১৯৮৪ সালের দাঙ্গার কথা উঠবে আর গোরক্ষকদের হিংসাত্মক কাণ্ডের কথা উঠলে মাওবাদী বা জিহাদিদের সন্ত্রাসের কথা উঠবে। নিরপেক্ষ যাচাইয়ের সুযোগ যেখানে নেই, সে সব ক্ষেত্রে এ সন্দেহ থেকেই যায় যে, নিরপেক্ষ তথ্যনিষ্ঠা নয়, নিজ নিজ নিহিত মতাদর্শগত অবস্থানের কারণেই 'ক' বাবু এক ধরণের তথ্যের উপর বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন এবং 'খ' দেবী অন্য ধরণের তথ্যের উপর।

'মতামতে'র মধ্যে একই 'তথ্যে'র বিবিধ ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যও পড়ে। যেমন ধরুন 'মোদীনমিক্স'-এর জাদু নিয়ে এত লম্বা-চওড়া দাবিদাওয়ার পরেও মোদীর শাসনে অর্থনীতি বৃদ্ধির হার গত দশকের তুলনায় বাড়েনি কেন? কেউ বলবেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার গাফিলতি - নোটবন্দির মত অপরিণামদর্শী নীতি নির্ধারণ কিংবা পণ্য-পরিষেবা কর চালু করা নিয়ে বিভ্রান্তি যার উদাহরণ। আবার কেউ বলবেন আগের সরকার দেশের অর্থনীতির যে বেহাল দশা করে গিয়েছে তার নিরাময় করতে সময় তথা কঠোর সংস্কার কর্মসূচির প্রয়োজন - তাঁরা আঙ্গুল তুলবেন বছর বছর ধরে জমে ওঠা অনাদায়ী ঋণের পাহাড় আর বাজেট ঘাটতির ফলে তৈরি হওয়া মুদ্রাস্ফীতির দিকে। দু'পক্ষের সমর্থনেই কিছু কিছু যুক্তি খাড়া করা সম্ভব, যেমনটা যে কোনও রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ব্যাপারের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কিন্তু কারও মতামত একেবারে আমূল বদলে ফেলতে পারবে এত মজবুত যুক্তি কোনও তরফেই নেই।

তাহলে এ সব নিয়ে তর্ক করে লাভ কী? আমার কত বুদ্ধি বা আমি কী ভালো কথা বলতে পারি সেটা অন্য পক্ষ তথা যাঁরা আশপাশে আছেন তাঁদের সামনে জাহির করা একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এই পন্থা নিলে জনপ্রিয়তা বাড়ার সম্ভাবনা কমই। ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচে অকারণ বাজে ফাউল করলে ব্যাপারটা সবার পক্ষেই অস্বস্তিজনক! আর কথা আছেনা, যে সবসময় সঠিক, সে শেষপর্যন্ত খুব একাকী হয়।

সুতরাং এসব ক্ষেত্রে তর্ক চালিয়ে যাওয়ার একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা অপরের মত বদলের চেষ্টাই (যদিও তা প্রায়শই পণ্ডশ্রম)। বন্ধু বা পরিজনদের সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ তথা মতাদর্শের অন্তত কিছুটা মিল রয়েছে বলেই আমরা ধরে নিই। তাদের সঙ্গে তর্কে জড়ানোর পিছনে সম্ভবত কাজ করে সেই মিলের জায়গাগুলিকে তুলে ধরে মতপার্থক্যটা কমানোর চেষ্টা। আরও সূক্ষ্ম স্তরে, এখানে প্রচারের একটা মানসিকতাও কাজ করতে পারে। অনেকেই আছেন যাঁরা তর্কে অংশগ্রহণ করছেন না কিন্তু শুনছেন। যাঁর সাথে তর্ক তিনি না হোন, শ্রোতাদের কেউ কেউ প্রভাবিত হতে পারেন তার জন্যে এটা একটা পরোক্ষ প্রচেষ্টাও হতে পারে।

অন্যের মত বদলের এই ইচ্ছাটা কোথা থেকে আসে আমাদের? চা ভালো না কফি, পাহাড় ভালো না সমুদ্র, এই নিয়ে মতান্তর থাকলেও দিব্যি হেসেখেলে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায়। একইসাথে বসে একজন চা একজন কফি খাওয়া যায়। একইসাথে পাহাড় আর সমুদ্র আছে এমন জায়গা না পেলেও আলাদা আলাদা বেড়িয়ে এসে একসাথে বসে বেড়ানোর গপ্পো করা যায়।

কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে সেটা করা কঠিন। এ বারের ভোটের কথাই ধরা যাক। রাজনৈতিক ভাবে বিপরীত মেরুতে আছেন এমন দু'জন মানুষ কিছুতেই একইসঙ্গে এই ভোটের ফলে খুশি হতে পারেন না। ভোটের ফলের প্রভাব কিন্তু পড়বে সবার উপরেই, সে আপনার মনোমত হোক বা না হোক। এই ক্ষেত্রে তাই 'যার যেমন রুচি'র নীতিটা সত্যিই খাটে না। কারণ আরেকজনের মত, যিনি এমনিতে আপনার প্রিয় একজন মানুষ, প্রত্যক্ষ্যভাবে যেখানে আপনার জীবনকে প্রভাবিত করছে, সেখানে আপনার অনুভূতির কথা মনে রেখে তাঁর মত বদলানোর জন্যে তাঁর বিবেক ও শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদন করার ইচ্ছেটা খুবই স্বাভাবিক। কখনো কখনো লোকের মত বদলাতেও পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা হয়না।

তার মানে বিতর্কের পেছনে যে যে কারণ আমরা চিহ্নিত করেছি, তার সাথে যোগ করতে হয় বিষয়টি নেহাতই ব্যক্তিগত রুচি বা মতাদর্শের ব্যাপার, না কি এমন বিষয়ে যার প্রভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পড়ে। কে কার বাড়িতে কোন সিরিয়াল দেখবে তা নিয়ে আমরা "যার যেমন ইচ্ছে" বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে যেতে পারি, কিন্তু কেউ এমন যন্ত্র বসিয়েছেন ফ্ল্যাটে যে কথায় কথায় হাউসিঙে ফিউস উড়ে আলো চলে যায়, সেখানে তো আর এই নীতি চলেনা।

৫

তাহলে কি দাঁড়ালো, বিতর্ক কি ভালো?

সব ব্যাপারে নয়, সবার সাথেও নয় কিন্তু যেসব বিষয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, সেগুলো নিয়ে আমাদের ছোট ছোট বৃত্তে বিতর্ক মেনে নেওয়া উচিৎ, এমনকি সাদরে অভ্যর্থনা করা উচিৎ। কারণ যে বিষয় সবার জীবন স্পর্শ করে সেখানে গণতান্ত্রিক আলোচনার পরিধি শুধু রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, বা বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক।

চায়ের দোকান, খাবার টেবিল, সোশাল মিডিয়া এইসব মঞ্চে যে বিতর্ক হয় সেগুলোও যেন ছোট ছোট পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্বলির মত। যে বিষয়ে মতভেদ ব্যক্তিগত রুচি বা মূল্যবোধ বা মতাদর্শের অমিল থেকে আসছে, সেখানে বিতর্ক তখনই করা উচিৎ যখন কিছু শেখার থাকে। তবে খেলার মাঠের মত, কিছু নিয়ম ও সহবত মেনেই তর্ক করা উচিৎ নয়তো নয়, কারণ তাতে শুধু অহেতুক তিক্ততাই তৈরি হয়।

কিন্তু যে বিষয়ের প্রভাব সবার ওপর পড়ে সেখানে বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া সোজা না, কাম্যও নয়। একমাত্র যাঁরা তর্কের নিয়ম ও সহবৎ না মেনে শুধু চেঁচামিচি বা ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন, তাঁদের সাথে তর্ক এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ, কিন্তু এমন যাঁদের স্বভাব তাঁদের সাথে তো কোন আলোচনাই বেশিদূর এগোয়না।

খেলায় যেমন খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তির (sportsman spirit) কথা বার বার উঠে আসে, সেরকম আমাদের উচিৎ বিতর্কের একটা সংস্কৃতি তৈরি করা যেখানে বিতর্কের সদর্থক মনোভাব (debating spirit) তার আবশ্যক অঙ্গ হয়। তার একটা বড় অংশ হোল, অন্যপক্ষের কথা শোনা এবং যিনি যা

বলছেন প্রথমেই তাঁর মূল্যবোধ বা মনুষ্যত্ব সম্পর্কে ভীষণ খারাপ ধারণা না করে তা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বিচার করা।

অন্তত শুরু তো করা যেতে পারে। কতদূর যাওয়া যায় দেখা যাক।